Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 17 –32
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন

Development of Buddhism and its reflection in Bengali literature of Mangalkavya

লিপিকা বিশ্বাস
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : lipikasb@gmail.com

Keyword

Mangal Kavya, Buddhist Literature, Arya Goddess, Loukik Goddess, Buddhist Goddess, Brahminism, Buddha Dharma, Pala Kingdom.

Abstract

Although there were no early influences of Buddhism in Bangladesh, the influence of this religion increased by the Pala kingdom. Tolerant of all Indian religions, opposed to caste and casteism system, this religion called all people under their broad umbrella. As a result, the whole common people of Bengal began to accept Buddhism more dearly. Brahmanism was patronized by the aristocracy and remained confined to the upper society. On the other hand, the populist trend of Buddhism dominated the vast masses of Bangladesh and this religion was able to harmonize with the secular religion. These gods and goddesses, who have the joint idols of secularism and Buddhism, they were enshrined in the Aryan nobility and once a time established in the Brahmanical temple. Because of this recognition of folk life, Brahmanism paved the way for its self-expansion. Brahminism combined with Buddhist-influenced secularism and the Mangalkavyas emerged as a literature of this combination. Bangladesh also had good relations with Java during the time of King Devpal of the Pala dynasty. The sculptures found in Java testify to that, such as Shiva Buddha, Vishnu Buddha etc. Charyapada is a book written by the laymen of Tantric Buddhism. Buddhists are also known for their skill in writing logic, medicine, astrology, grammar-dictionaries etc. During this period, there was an improvement in various fields of literature. South India's controversial victor Shilabhadra was a student of Professor Baiakaran Chandragomi, who was taught at Nalanda University. Chandragomi wrote Chandravakarana. Buddhists are known for their skill in writing such as Amar kosha. The Kosh has three organelle stages, like Anga, Anekarrtha and the linga. Many knowledge can be found around these three. Various questions have been raised about this 'Hindu-Buddhist' doctrine. At the end of the 19th century, Harprasad Shastri was called the culture of Bengal a 'Pracchanna Bouddha Sanskriti'. His doctrine created a great stir in the history of Bengali literature and culture. In the history of ancient Bengal, the history of Bengali glory that has been written during the period of expansion of Buddhism in Bengal.

Discussion

ভূমিকা :

বৌদ্ধধর্মের বহুপ্রসারী ধারা বাংলাদেশকে আপন মহিমায় প্লাবিত করে, দীর্ঘকাল বাংলাদেশের মাটিতে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। যুগে যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছিল। সর্বধর্মের প্রতি সহিষ্ণু, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে, এই ধর্ম সকল মানুষকে আপন বৃহৎ ছাতার তলায় আহ্বান জানিয়েছিল। ফলস্বরূপ বাংলার সাধারণ জনসমাজ বৌদ্ধধর্মকে অধিকতর প্রিয় করে গ্রহণ করতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম অভিজাতশ্রেণীর পরিপোষকতা লাভ করে সমাজের উঁচু স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের লোকমুখিন প্রবাহ বাংলাদেশের বিপুল জনসাধারণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়। এই লৌকিকধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের যৌথমূর্তিধারী দেবদেবীগণ আর্য আভিজাত্যে মণ্ডিত হয়ে একসময়ে ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লোকজীবনের এই স্বীকৃতিদানের পরিণতি হিসেবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিজের আত্মপ্রসারণের পথ প্রশস্ত করে। বৌদ্ধ প্রভাবিত লৌকিকধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয় ঘটে, আর এই সমন্বয়ের ফসল হিসেবে উঠে আসে মঙ্গলকাব্যগুলি।

মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি :

সমাজ-জীবন স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। আর এই ক্রমপরিবর্তন সাধিত হয় প্রধানত তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেমন – আদিম সমাজ, লোক সমাজ, এবং নাগরিক সমাজ। এই আদিম সমাজের বীজকে সংগ্রহ করেই ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয় লোকসমাজ। এই শ্রেণির থেকে রসদ নিয়ে বেড়ে ওঠা সাহিত্যের নাম হল লোকসাহিত্য। আদিম সমাজ ছিল গোষ্ঠী নির্ভর। পরিবার গুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা একটি আলাদা গোষ্ঠীর রূপ লাভ করত। এভাবে বহু গোষ্ঠীর উদ্ভব হলে সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যায়। তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে। এরফলে উভয়ের বিনাশের পথ প্রশস্ত হয়। ফলে বহু আদিম গোষ্ঠী আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে আবার কিছু জাতি নিজেদের মধ্যে একই ঐক্যসূত্রের মিলন ঘটিয়ে, উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। বাংলা দেশেও এইরূপ একটি ছবি দৃশ্যত হয়েছে। এখানেও বিভিন্ন প্রকৃতির আদিম জাতির বাসভূমি ছিল। কিন্তু পড়ে তারা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন তৈরি করে অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিজেরা আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছে। এই টিকে থাকা পল্লীসমাজের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল মঙ্গলকাব্যের ধারা -

> "আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।"[১]

ত্রয়োদশ শতক যেখানে বাংলার ইতিহাসে ঘটে তুর্কী আক্রমণ (১২০১ খ্রিস্টাব্দে)। যার ফলস্বরূপ সমাজের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনকি এই আক্রমণের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। আর্য-অনার্যের সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সমন্বয়, যাকে এককথায় সংক্রান্তিকাল বলা যায়। যা এতদিন অব্যাহত ছিল। তুর্কী আক্রমণ এই প্রক্রিয়াটিতে অনুঘটকের কাজ করেছিল। সবদিক থেকে বিপর্যস্ত উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিম্নবর্ণের সঙ্গে মেলবন্ধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পর্ব অত্যন্ত জরুরি। অনার্য লোকায়ত অন্ত্যজ দেবতারা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্যদেবতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের পর প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয়েছে। আবার নিম্নবর্ণের দেবতাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে। এই সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের কাহিনি মঙ্গলকাব্যগুলিতে রূপ পেয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দেবতারা অবলুপ্তির হাতথেকে রক্ষা পেতে লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করে। পরবর্তীকালে এই

দেবতারা ব্রাহ্মণ্যদেবায়তনে স্থান করে নেয়। উল্লেখিত এই দেবভাবনাগুলি সম্পূর্ণ লৌকিক ভাবনা থেকেই উঠে আসা। মঙ্গলকাব্যের প্রধান মিশ্রসত্ত্ব দেবতারা হলেন – মনসা, চণ্ডী, শিব, ধর্মঠাকুর। শীতলা, কালিকা, ষষ্ঠী, রায়, সূর্য, অন্নদা, সারদা, তীর্থ প্রভৃতি অপ্রধান মিশ্রসত্ত্ব মঙ্গলকাব্যের দেবতা।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও সাহিত্যে তার রূপায়ণ :

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। যেমন– শ্রীলঙ্কা, চীন জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে। তার জীবিত কালে বৌদ্ধধর্ম ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সমসাময়িক ভারতবর্ষে ষোড়শ মহাজনপদ[২]–এ বিভক্ত ছিল। সেখানে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এমনকি ভগবান বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যেও কোন বাঙালির নাম পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর মহাপরিনির্বানের পর থেকেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের কিছুটা হলেও প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেগুলি এই স্মৃতি বহন করেছে। তেলপত্ত জাতক[৩] যেখানে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এছারাও এখানে তক্ষশিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বুদ্ধদেব 'দেসক' শহরে কিছুদিন অবস্থান করেছে যা ছিল সুম্ভের অন্তর্গত। অঙ্গুত্তরনিকায়[৪]-এ যেখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিয়েছিল। যেমন– দণ্ডবিধি, প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে 'বঙ্গন্তপুত্ত' নামে একজন বৌদ্ধ আচার্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই আচার্য যে আসলে বঙ্গের সন্তান সেই সম্ভাবনাও উত্থিত হয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর আশি বছর জীবনের মধ্যে প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি কোথায় কতদিন অবস্থান করেছিলেন তা লিখিত রয়েছে তাঁর শিষ্য আনন্দ সারিপুত্ত ও অন্যান্য শিষ্যদের বর্ণনায়। চুল্লবগ্ গ মহাবংস ও দীপবংস প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে প্রথম মহাসভা (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০), দ্বিতীয় মহাসভা (খ্রিস্টপূর্ব ৩০৪-৩০২) ও তৃতীয় মহাসভার (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০) যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে রাজগৃহ, বৈশালী ও পাটলিপুত্র এই তিন মহাসভার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই মহাসভাগুলিতে বিভিন্ন রাজ্যের ভিক্ষুগণ যোগদান করলেও বঙ্গদেশের কারও উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। রাজা অশোকের সময়েই বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীর বাণী ভারতবর্ষসহ বহির্ভারতকেও সঞ্জীবিত করেছিল-

> "খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ সাহিত্যে ও স্থাপত্যে এমন বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যাহার দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ হয়, এই সময় হিতে বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে এবং ভারতব্যাপী বৌদ্ধ চিন্তানায়কগণও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আর অনবহিত নহেন।"[৫]

নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালেখ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়–চতুর্থ শতক নাগাদ খোদিতভাবে বঙ্গের নাম পাওয়া যায়। যা ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্রসমূহের মধ্যে একটি। এছাড়াও খ্রিস্ট পরবর্তী প্রথম শতাব্দীর বেশ কিছু নিদর্শন বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের কথা প্রমাণ করে –

> "খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দ্বাদশজন মহাস্থবির অক্ষয়কীর্তি ও চারিত্রিক ঔদার্যের জন্য সমস্ত বৌদ্ধ জগতে পূজা পাইয়াছিলেন। সেইদিন 'কালিক' নামে একজন বাঙালীও এই স্থবিরমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন।"[৬]

এরপর চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান হলেও বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার লোপ পায় না। গুপ্ত রাজারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন তাই তারা অন্যের ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করেননি। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং জানিয়েছেন মহারাজা শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য একটি মৃগস্থাপন স্তূপের কাছে একটি চীনা মন্দির ও প্রতিষ্ঠা করেন, যার প্রমান এখনও বিদ্যমান। শুধু তাই নয় গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীন পরিব্রাজক ফা–হিয়েন ভারতে আসেন যিনি দুই বৎসর কাল ধরে তাম্রলিপ্ত বন্দরে বৌদ্ধচিত্র, মূর্তি সংকলনে ব্যাপৃত ছিলেন, সমগ্র আর্যাবর্ত

পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে। এই যুগের আবহাওয়া এতটাই অনুকূল পরিস্থিতির বার্তা এনেছিল যে– ধর্ম, দর্শন, কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ, গণিত, স্থাপত্য ও চিত্রকলা সমগ্র দিক থেকেই ভারতের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে ভারতের নাম ইতিহাসের পাতায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। কালে কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রমাণস্বরূপ কিছু কিছু মূর্তিশিল্প ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রিস্ট পরবর্তী ষষ্ঠ–সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাংলার বিভিন্ন অংশে – কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে সত্তোরাধিকের ও বেশি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যেখানে আট হাজার বৌদ্ধভিক্ষু বাস করত। তখন ভারত পরিদর্শনে আসেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যিনি শশাঙ্কের বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের কথা জানাননি। তবে গয়া বা কুশীনগরের বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্তকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সাম্রাজ্যেও ভগবান বুদ্ধের উপাসনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং পরিবারের মধ্যেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সদস্যরাও বিনা দ্বিধায় একসঙ্গে বাস করত। সমাজেও সেই ছবি ধরা পড়েছিল। দ্বিবিধ ধর্মের একত্রে বসবাসের ছবি ধরা পড়ছে খনার বচনের মধ্যে। খনার বচনগুলি সম্ভবত লেখা হয়েছিল ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে যখন সমগ্র দেশ জুড়ে বিভিন্ন রকম ধর্মীয় ও জীবন আদর্শে বিশ্বাসী লোকের সমাবেশ ছিল দেশে, যার ফলে এক অভূতপূর্ব ও অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল অন্তর্দেশীয় সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। সেইসঙ্গে নানা মতের লোকজন পাশাপাশি অবস্থানের ফলে মানুষের উদারতা ও সহনশীলতাও খানিকটা বেড়েছিল। বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, শৈব, সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ, বাউল ও চার্বাকদের বিভিন্ন মতবাদও তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলি, বিভিন্ন জনজাতির নামেই খণ্ড খণ্ড রূপে পরিচিত ছিল। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের চেষ্টাতেই এই খণ্ডিত রাজ্যগুলি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার নিদর্শন রেখেছে। এবং পুণ্ড্রবর্ধন[৭], গৌড় ও বঙ্গ নামে তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় নামের লোপ হয় শুধু বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্ধনের আবির্ভাব হয় থানেশ্বরের সিংহাসনে। এই দুই রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একদিকে যেমন দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলাকে ডেকে আনে তেমনি অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথ পরিষ্কার হয়।

অষ্টম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ববঙ্গে যে কয়টি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারা প্রত্যেকেই ছিলেন বৌদ্ধ মতাবলম্বী। অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গে ও সমতটে[৮] খড়্গ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহারাজ দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রফলকের লিপি থেকে এই বংশের চার পুরুষের নাম পাওয়া যায়– খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ ও রাজরাজভট। সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে আগত চৈনিক পরিব্রাজক সিংচির বর্ণনা থেকে জানা যায়– এই বংশের চতুর্থ রাজা রাজভট, যিনি পরম সৌগত ত্রিরত্নের উপাসক ছিলেন। তিনি প্রত্যেকদিন ভগবান বুদ্ধের একলক্ষ করে মনে মনে মূর্তি গড়তেন ও সেইসঙ্গে মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা[৯] সূত্রের একলক্ষ শ্লোক ও পাঠ করতেন। রাজভটের দানশীলতার কথাও জানা যাচ্ছে। এই রাজা বুদ্ধদেবের শোভাযাত্রা বের করতেন। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকত অবলোকিতেশ্বর-এর মূর্তি, এর পিছনে থাকতেন সকল শ্রমণেরা, সর্বশেষে থাকতেন রাজা নিজে। এই খড়্গ রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় সমতটে বৌদ্ধধর্মের গৌরব আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। খড়্গ রাজবংশের পরে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ নৃপতি মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করেন কান্তিদেব। যার পরিবারের মধ্যে সর্বধর্মের প্রতি উদারতার ছবি ধরা পড়েছে। কেননা তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর জননী শিবের উপাসিকা ছিলেন। রাজ পরিবারের এই মহৎ দৃশ্য জনসাধারণের কাছেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার শোচনীয় হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষাই তাঁর রাজ্যকে শত্রুর করতলগত করে দিয়েছিল। সেইসময় কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা গৌড় রাজ্য জয় করে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করে নেন। আনুমানিক ৬৩৮ অব্দে হিউয়েন সাং বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ ও কজঙ্গল এই পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে তাদের রাজধানীগুলির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্যের রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন এরূপ অনুমিত হয়েছে। একদিকে রাজা হর্ষবর্ধন অন্যদিকে রাজা ভাস্করবর্মা, ওই দুই রাজনের আক্রমণ শশাঙ্কের রাজ্যের ধ্বংসহয়। এছাড়াও

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কলহ, বিদ্রোহও এই জন্য খানিকটা দায়ী ছিল। ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ অব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে, তিব্বতরাজ কামরূপ পূর্বভারতের কিছু অংশ দখল করেন। রাজা ভাস্করবর্মা ও খুব বেশীদিন রাজ্য সুখ ভোগ করতে পারেন না। এরপর জয়নাগ নামে এক রাজার আবির্ভাব ঘটে। যিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই রাজার পরবর্তী সময়কাল সম্পর্কে উল্লেখিত – ইহার পরবর্তী একশত বৎসর গৌড়ের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা করেছিল। এই যুগে অনেক বহিঃশত্রু এই রাজ্য আক্রমণ করেছিল। এই যুগকে মৎস্যন্যায় যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই যুগের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে পরস্পর হানাহানিতে মেতে ওঠে। ফলে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পরস্পরের অবিশ্বাসের লড়াই থেকে তৎকালীন মানুষকে রেহাই দেন গোপালদেব নামক ঐতিহাসিক রাজা। যার হাত ধরেই গৌরমণ্ডলে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। এই রাজা সম্পর্কে আরও জানা যায় যে - বপ্যটের পুত্রের নাম গোপালদেব। গোপালদেবকে পালবংশের প্রথম রাজা বলা যেতে পারে। পরিব্রাজক তারানাথের উল্লেখ থেকে জানা যায় গোপালদেব বঙ্গ, মগধ, জয় করেন। যা থেকে অনুমান করা যায় মগধ ও পাল-রাজবংশের আদি নিবাস ছিল না। গোপালদেবর পূর্বে গৌড় সাম্রাজ্যে কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। শূরবংশের রাজত্বকালের শেষভাগে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজরা পরস্পর বিবাদ করে প্রজাদের দুর্দশার একশেষ ঘটিয়ে তুলতেন। গোপালদেব এই রাজাদেরকে পরাজিত করে তাঁদের অত্যাচার দমন করেন। আবার প্রজারাও এক রাজার অধীন হওয়ায় শান্তির আবহ তৈরি হয়।

এই পাল নৃপতিগণ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোপালদেবের পরবর্তী রাজা ছিলেন ধর্মপালদেব যার রাজসভায় বর্ধন কুঞ্জর নামে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। রাজা ধর্মপাল সর্বধর্মের প্রতি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন–

> "ধর্মপাল গঙ্গার বামতীরে একটি পর্বতের উপর বিক্রমশীলা নামক বিহারস্থাপন করিয়া তাঁহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য বিস্তর ভূমি দান করেন। বিক্রমশীলা বিহারের অপর নাম বিক্রমশীল দেব মহাবিহার। এই বিহার নিকট একশত সাতটি দেবমন্দির প্রাকার বেষ্টিত ছিল।"[১০]

পাল রাজারা প্রায় তিনশো বছর গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রধান তত্ত্ব ছিল ক্ষান্তি বা খন্তি[১১], যা এই পাল নৃপতিগণ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পূর্বে বৌদ্ধরাজা অশোকও সেই নীতিকেই মেনে চলেছিলেন। এই ক্ষান্তি শুধু রাজসভাতেই আবদ্ধ না থেকে জনসাধারণের হৃদয় পর্যন্তও ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ একে অন্যের সঙ্গে সৌভাতৃত্বের বোধ গড়ে তুলতে পেড়েছিল। এখানেই বাঙালির স্বকীয়তা। এই কারণেই পরবর্তী সেন রাজসভার কবি জয়দেব বুদ্ধকে সম্মানের সহিত স্মরণ করে বলেছেন একটি শ্লোকে –

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধরহহ শ্রুতি জাতম্।
> সদয়হৃদয়- দর্শিত পশুঘাতম্।।
> কেশব ধৃত – বুদ্ধশরীর জয় জগদীশে হরে।"[১২]

ভারতবর্ষে যখন হিন্দু-বৌদ্ধের লড়াই চলছে তখন জয়দেব তার গ্রন্থে বুদ্ধকে ভগবানজ্ঞানে নমস্কার জানিয়েছেন। এবং যজ্ঞের নামে পশু হত্যা রোধের জন্য তার কাজের প্রশংসা করেছেন। পাল যুগেই প্রথম ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে বৌদ্ধ দেবতারা স্থান করে নিতে পেরেছিল। এবং ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনের দেবতারাও বৌদ্ধদের কাছে পূজা পেয়েছে যেমন - সরস্বতী মঞ্জুশ্রীর শক্তিরূপে পরিগণিতা, বৌদ্ধ বাগেশ্বরী সিংহবাহনা, বৌদ্ধ কুলদেবী ব্রাহ্মণ্য কালীর নামান্তর। ব্রাহ্মণ্য মহাদেব যিনি সমুদ্রমন্থনকালের বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন বলে তার নাম হয়েছিল নীলকণ্ঠ। বৌদ্ধদের কাছে এই দেব হয়ে যায় – নীলগুটিকাবিশিষ্টকণ্ঠং। আবার বৌদ্ধ তারা হিন্দুদের দশমহাবিদ্যা[১৩]-র মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। বর্তমানে কিছু কিছু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে বাঙালির হাতের স্পর্শের দাগ রয়েছে বলে অনুমিত হয়েছে।

পাল বংশের রাজা দেবপাল (৮৩০–৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে) যিনি ধর্মপালের পরে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। গঙ্গার উৎপত্তি থেকে শুরু করে পশ্চিমে সাগরের তীর পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজার সময়ে বৌদ্ধ পরিব্রাজক বীরদেব বহুকাল তার রাজ্য বাস করেছিলেন। তার সময়ে জাভার সঙ্গেও বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, জাভাতে প্রাপ্ত মূর্তিশিল্প সেইকথার সাক্ষ্য দান করেছে। যেমন- শিববুদ্ধ, বিষ্ণুবুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তির পরিচিন্তন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে শিববুদ্ধের একটি মূর্তিটি সংরক্ষিত রয়েছে। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন মূর্তিটি বরিশাল জেলার কেশবপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধাতুময় মূর্তিটির দ্বিভুজ অর্ধ নিমীলিত দৃষ্টি, ঢলঢল মুখমণ্ডল, মৃদুহাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নের ভাব প্রকাশক, সুদীর্ঘ কমনীয় দেহকান্তি, আকারে ছোট, ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট। এই মূর্তির মধ্যে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধ্যান্য ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যেকেই প্রকাশ করছে। এছাড়াও বুদ্ধমূর্তি গড়তে গিয়ে বাঙালিরা কতোটা আত্মনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তিগুলি সেই বিষয়টি প্রমাণ করেছে।

আক্ষরিক অর্থে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধ বলতে- উদ্বোধিত, জ্ঞানী, জাগরিত মানুষকে বোঝায়। উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং পরম জ্ঞানকে বোধি বলা হয়। যে অশ্বত্থ গাছের নীচে তপস্যা করতে করতে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন তার নাম বোধিবৃক্ষ। যে কোন মানুষই বোধিপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত এবং জাগরিত হতে পারে। সিদ্ধার্থ গৌতম এইসময়ের এমনই একজন বুদ্ধ যে উক্ত বোধিসত্ত্ব[১৪] লাভ করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ববর্তী জীবন সমূহকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব জন্মের সর্বশেষ জন্ম হল বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জন্ম। ত্রিপিটক[১৫]-এ বোধিসত্ত্ব হিসেবে ৫৪৭ (মতান্তরে ৫৫০) বার বিভিন্ন কূলে জন্ম নেবার ইতিহাসের উল্লেখ রয়েছে। তিনি তাঁর পূর্বের জন্মগুলোতে প্রচুর পুণ্যের কাজ করে দশপারমিতা[১৬] বা পারমী সঞ্চয় করেছিলেন। সর্বশেষ সিদ্ধার্থ জন্মে বুদ্ধ হবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের ফলে তিনি এই দুঃখময় সংসারে আর জন্ম নেবেন না, এটাই ছিলো তাঁর শেষ জন্ম। পরবর্তী মৈত্রেয় বুদ্ধ[১৭] জন্ম না নেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁর শাসন চলবে। তিনি পরকাল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়েছেন, পরকাল নির্ভর করে মানুষের ইহ জন্মের কর্মের উপর। মৃত্যুর পর মানুষ একত্রিশ লোকভুমির যে কোনো একটিতে গমন করে। এই একত্রিশ লোকভুমি হল চার প্রকার অপায় (পাখি, কুল তীর্যক -পশু) প্রেতলোক (পেত্নী-প্রেত), অসুর (অনাচারী দেবকুল)। নরক সাত প্রকার মনুষ্যলোক, চতুর্মহারাজিক স্বর্গ, তাবতিংশ স্বর্গ, যাম স্বর্গ, তুষিত স্বর্গ, নির্মানরতি স্বর্গ, পরনির্মিত বসবতি স্বর্গ। ষোলো প্রকার রূপব্রম্মভূমি ও চার প্রকার অরূপব্রম্মভূমি রয়েছে। এই একত্রিশ প্রকার লোকভূমির উপরে সর্বশেষ স্তর হল নির্বাণ। মানুষ যদি খারাপ কাজ করে তাহলে তারা প্রেতলোক, অসুর, নরক ও তির্যক এই সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করে সাজা ভোগ করে। আর ইহজন্মে মানুষ যদি ভালো কাজ করে তাহলে মৃত্যুর পর সেই মানুষ বাকি সাতাশ লোকভুমিতে গমন করে। বুদ্ধের এই যাবতীয় কর্মাবলী বাঙালী শিল্পীরা নিপুণতার সঙ্গে মূর্তিশিল্পের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশে যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। বাঙালির মানস প্রকৃতিকে বুঝতে হলে বৌদ্ধধর্মের পর্যালোচনা প্রয়োজন। বাংলা ও মগধের জনমানসকে অষ্টম–দ্বাদশ এই চারশো বছর এই ধর্মই পরিচালনা করেছে। এছাড়াও বুদ্ধ জীবনের অন্যান্য ঘটনার তুলনায় সম্বোধিলাভের ঘটনাই বিশেষ করে বাঙালি শিল্পীকে প্রভাবিত করেছিল। বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও মহাযানী প্রতিমা রূপায়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাযানী অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের মূর্তি যেখানে – সূর্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই সমস্ত দেবতাদের গুণাবলী দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। এই মূর্তি দর্শনে অনুভব হয় - একদিকে তিনি কঠোর পৃথিবীর কল্যাণ সাধনে, অন্যদিকে তিনি গরীব দুঃখীদের আর্তনাদে করুণাঘন আনতদৃষ্টি প্রদর্শন করেছেন। মহাযানী বৌদ্ধমূর্তির মধ্যে তারা দেবীর প্রতিমাই বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। যিনি অবলোকিতেশ্বরের শক্তির দেবী। এছাড়াও হারিতি, মঞ্জুশ্রী, পর্ণশবরী প্রভৃতি সকল দেবতার মূর্তিই বাংলার মাটিতে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঢাকা, ত্রিপুরা, দিনাজপুর, বাগুড়া ও পূর্ববঙ্গের মধ্যেই এর প্রাধ্যান্য দেখা গেছে। এই জনপদের মানুষের মধ্যে মহাযান-বজ্রযান এই ভাবধারার মধ্যে যথেষ্ট সুসমন্বয় গড়ে উঠেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯) উপন্যাসের মধ্যেও বজ্রযানী বৌদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদান করেছেন।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম শুধু বিস্তার লাভ করেই থেমে থাকেনি। বরং বাংলা সাহিত্যের বিকাশের পথকে করে তুলেছিল আরও প্রশস্ত। বৌদ্ধ মহাবিহারগুলিও এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রেখেছে। কেননা পালযুগে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযুক্তি ঘটে, যার ফলে বাঙালি বৌদ্ধশিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলনের প্রতিফলনকে তুলে রাখা হয়েছিল -

> "বৌদ্ধ যুগের বাঙালীর ইতিহাস বাঙালীর আত্মজাগরণের ইতিহাস।"[১৮]

এই কথার যথার্থতা বিচার করতে হলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের কাছে ফিরে যেতে হবে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে মানুষ যেমন বৌদ্ধ জোয়ারে গা-ভাসিয়ে ছিল তেমনি তারা বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুঁথি বা গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। আলোচ্য যুগের বাঙালীদের জ্ঞানস্পৃহা, মননশীলতা এই সবকিছুরই স্পষ্ট ছবি ধরা পড়ছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন ব্রাহ্মণদের দলে টানতে পারলে বৌদ্ধরা খুব আনন্দ উপলব্ধি করতেন, কারন তাহলে তাদের সংকৃত গ্রন্থ রচনার সুবিধা হত। সেই সময়ের গুপ্ত ও কর উপাধিধারী ব্যক্তিদের লিখিত গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া যায় -

> "কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদেরতো কথাই নাই। ইহারাই বৌদ্ধভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরুপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।"[১৯]

বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দুটি মতবাদের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। প্রধান অংশের নাম হীনযান[২০] বা থেরবাদ, সংস্কৃতে একে আবার স্থবিরবাদ ও বলা হয়, ও দ্বিতীয় অংশের নাম মহাযান[২১]। অন্যদিকে মহাযান শাখাও দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা– মাধ্যমিক[২২] ও যোগাচার[২৩]। মাধ্যমিক মত পরে 'শূন্যবাদ' নামধারণ করে,কারণ তাঁদের মতে বস্তু, চৈতন্য সবই শূন্য। যোগাচারবাদীরা প্রচার করতে থাকেন জগতের সর্বস্থানেই ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি রয়েছে। যা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। হীনযান শাখারও দুটি আলাদা মতবাদ সৃষ্টি হয়।

সপ্তম শতক পর্যন্ত এই দুই শাখা জনপ্রিয়তা পেলেও অষ্টম শতক নাগাদ পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে এই মতবাদগুলি নিজের জায়গা হারাতে বসে। তখন বৌদ্ধধর্মের ভাবধারাতেও যুগান্তরকারী পরিবর্তন আসে। হিন্দুপুরাণের ন্যায় এখানেও আবির্ভূত হলেন বৌদ্ধ দেবদেবী। একই সঙ্গে তাল রেখে হিন্দু তান্ত্রিকমত, কৌলধর্ম, শৈবধর্ম ও নাথধর্ম এই সকল ধর্মগুলি বৌদ্ধধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বৌদ্ধ বিদ্যায়তনে শুরু হয়ে যায় বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার আচরণ। যা মন্ত্রযান[২৪] নামে পরিচিত হয়। এই মন্ত্রযানের মধ্যে অবস্থান করছে – কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান। বজ্রযান ও কালচক্রযান-এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বজ্র শব্দের অর্থ বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে হয় শূন্যতা। এই বজ্রকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দেবদেবীর নামকরণ হয়েছে, যেমন - বজ্রধাতেশ্বরী, বজ্রেশ্বরী, বজ্রসারদা প্রভৃতি। বজ্রযানের শেষ পরিণতি সহজযান[২৫]। এই সহজযানের পর বৌদ্ধ ধর্মের আর কোন পরিবর্তিত রূপের কথা জানা যায় না, এখানেই এই ধর্মের শেষ বলে ধরে নিতে হয়। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম প্রজ্ঞাপারমিতা[২৬]। যেখানে ভগবান বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী রয়েছে বলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস। তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যের ফসলের নিদর্শন বেশিরভাগ অংশই চলে গেছে ধ্বংসের কবলে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সহজযানীদের হাতে রচিত গ্রন্থ চর্যাপদ। এই গ্রন্থের সময়কাল ও লেখকদের সম্পর্কে জানা যায় –

ঠিক কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম এই বিভিন্ন যানে বিভক্ত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন তবে পাল যুগের বাঙালাদেশের মননশীলতা ও ধর্মীয় জীবন বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রভৃতি দ্বারাই নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এই যুগেই কাহ্ন, সরহ, লুই, তিলোপাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত সিদ্ধাচার্যগণ চর্যা ও দোহা রচনা করিয়াছেন। এই চর্যা ও দোহায় বাঙালীর প্রাণের প্রকাশের বেদনা ও রসের আবেগ সর্বপ্রথম বাঙালীর কণ্ঠে বাঙালীর নিজের ভাষায় স্ফূরিত হইয়াছে।[২৭]

এছাড়াও তর্কবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষদর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান প্রভৃতিতেও তাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনেই এই সময়ে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা পাণিনির টীকা রচনা করেন যেখানে পতঞ্জলির মহাভাষ্যকে তেমনভাবে গ্রহণ করেননি ফলে তাদের গ্রন্থ জন সমাজে বেশি জনপ্রিয়তা পায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী যার ছাত্র ছিলেন দক্ষিণভারতে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী মহাবিহারের কৃতি ছাত্র শীলভদ্র। চন্দ্রগোমী রচনা করেন চান্দ্রব্যাকরণ। কোষ রচনায় তাদের দক্ষতার কথাও জানা যায় যেমন অমরকোষ। কোষের তিন অঙ্গ পর্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ। এই তিনকে ঘিরেও তাদের বহু জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ছন্দ বানান এগুলির জন্যও তাদের লিখিত বইয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ছন্দের বই হল ছন্দোমঞ্জরী। শব্দশাস্ত্রেও তাদের আনাগোনার কথা জানা যায় ন্যায়সূত্র নামক গ্রন্থটি এর উদাহরণ।

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলিও চমৎকারিতার প্রমাণ দেয়। বৌদ্ধদের মূলত দুই ধরণের গল্পের কথা জানা যায়। যথা জাতকের গল্প ও অবদানের গল্প। জাতকের গল্প গুলিতে রয়েছে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা আর অবদানে থাকে তাঁর চেলাদের পূর্বজন্মের কথা। দশম-এগারো শতক নাগাদ তাঁরা স্মৃতির পুস্তক লিখতে শুরু করেন যেখানে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করার পদ্ধতি লেখা থাকত। শেষের দিকে তাঁরা লিখতে শুরু করে তন্ত্রের বই যেখানে মূলত রয়েছে মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবতা মূর্তি তৈরি পদ্ধতি ইত্যাদির কথা। প্রতিমালক্ষণ বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ সাধনমালা। ব্যাকারণ রচনাতেও তারা পারদর্শিতা দেখান যেমন – চান্দ্র ব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি। সেই সময়ে রচিত বৌদ্ধ অভিধান ও পাঠককে চমকে দেয়, যেমন – নামলিঙ্গানুশাসন, ত্রিকাণ্ড,বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতি। আবার বৌদ্ধ বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার উজ্জ্বল নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রানুশাসনের মধ্যেও প্রকীর্ণ রয়েছে। কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার সভাকবি তার রচনার শুরুতে শিব ও ধর্মের জয়গান করেছেন। এবার প্রশ্ন ওঠে এই গ্রন্থগুলি সব কোথায় গেল? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করেছেন। তাঁর ভাষায় –

এ বৌদ্ধ সাহিত্য গেল কোথায়? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর - হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে।[২৮] বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বৌদ্ধ সাহিত্যের অস্তিত্বও নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধ্বংসের ফলে শুধু বৌদ্ধ স্মৃতিই লোপ পায়নি, বাঙালির ইতিহাসও অনেকাংশে মুছে গেছে।

কিছু সাহিত্যে সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন - সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত মানস’ যেখানে কাব্যের কবি বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার নৃপতি দেবপালের সভাকবি অভিনন্দের কাব্যের দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনায় বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কবি জয়দেবের উদারতার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বাংলা সাহিত্য রচিত না হলেও বাঙালির ভাষা ও জীবনচর্চার সঙ্গে মিল রয়েছে প্রচুর। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় গ্রন্থটির সংকলকের নাম জানা যায়নি, গ্রন্থের শুরুতে বুদ্ধপ্রশস্তি দেখে অনুমান করা হয় যে সংকলক বৌদ্ধ প্রভাবিত ছিলেন। মহাযান ধর্ম লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে মিলনের ফলে তান্ত্রিক উপযান তৈরি হয়। এই তান্ত্রিক উপযানের পালনকারীরা নিজেদের পরিচয়কে লুকিয়ে রেখে প্রাচীন বাংলা ভাষায় নিজ মতের তত্ত্বকথা রচনা করতেন। পরবর্তী হীনযানদের ওপরেও এই গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েছিল। দোহাকোষ ও চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। সহজযানীরা পূজা – অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্রজপে তেমন বিশ্বাস করতেন না, তাঁদের বিশ্বাস ছিল নিজের শরীরের মধ্যেই বুদ্ধের অবস্থান রয়েছে। জপ-তপ সব কিছুর মধ্যে দিয়ে শরীরের মধ্যে থাকা দেবত্বের সন্ধান করতে চেয়েছেন –

“পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌ খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।।
অমণাগমণ ণ তেন বিখণ্ডিঅ।
তোবি নিলজ্জই ভণই হউ পণ্ডিঅ।।”[২৯]

বৌদ্ধ ভাবধারাকে আশ্রয় করে যে সকল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার সামান্য অংশের কথা উল্লেখ করা হল। দশম-একাদশ শতাব্দীতে যে সান্ধ্যভাষার জন্ম হয়েছিল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণেরা তাঁদের রচিত গানের কথায় সেই ভাষা ব্যবহার করেই মনের ভাব প্রকাশ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধভাবনা বিষয়ক সাম্প্রতিক গবেষণার তাৎপর্য :

উদারপন্থী বৌদ্ধ পাল সাম্রাজ্যের পতন, ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন সাম্রাজ্যের উত্থান ও তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধধর্মের চরম বিপর্যয় ঘটে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অবলুপ্তির কথা সুপ্রচলিত ইতিহাস রূপে গণ্য হয়েছে। কিন্তু পাঠকদের জেনে রাখা দরকার এই হিন্দু-বৌদ্ধ দেবদেবী বিষয়ক গবেষণা সাম্প্রতিক কালে গবেষক মহলে বহু গুরুত্বের দাবি রাখছে। অতি সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় প্রচলিত এই হিন্দু-বৌদ্ধ মত সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলার সংস্কৃতিকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সংস্কৃতি' বলে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর এই মতবাদ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বাঙালির গৌরব সম্পর্কিত যে সকল ইতিহাস রচিত হয়েছে এই পর্যন্ত, তার সমগ্রটাই রচিত হয়েছে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের যুগে। সিস্টার নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১ খ্রিস্টাব্দ) গুরু স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পেরে, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরে বেশ কিছু বৌদ্ধ নিদর্শন ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করে বৌদ্ধশিল্প থেকে তিনি বৃহত্তর অর্থে হিন্দু শিল্প রূপেই বুঝতে চেয়েছিলেন, সেই বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন ইউরোপীয় চিত্রকলা কেবল শিল্পীর উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা বৃত্তি হতে পারে না, কিন্তু ভারতীয় শিল্পীর কাছে তা জাতিগত উত্তরাধিকার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা মনে করতেন না। বরং তাঁর মতে বুদ্ধ একজন উচ্চ স্তরের হিন্দু আচার্য ছিলেন। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে –

> "আমাদের দেশে আর্যভাষার সব স্তরের সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া। ধর্মকথা বহন করিয়াই যুগে যুগে নতুন ভাষা সাহিত্যের সভায় আসন পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার বেলায়ও ইহার অন্যথা নাই। বাঙ্গালা ভাষা যখন সদ্যজাত, ইহার রূপ যখন অত্যন্ত অপরিণত, তখন সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালী শিষ্ট কবিপণ্ডিতের সাহিত্যচর্চা চলিত। আর যাহারা শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের ধার ধারিতেন না তাঁহারা সংস্কৃত –অশিক্ষিত জনসাধারণের বোধগম্য "ভাষা" তে গল্প – গান – ছড়া রচনা করিতেন। এই সূত্রেই বৌদ্ধ ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্যে প্রথম অনুশীলিত হয়েছিল।"[৩০]

ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী গৌড়ের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি সম্পর্কে জানিয়েছেন –

> "এখন ভারতবর্ষের সমতল ক্ষেত্র হইতে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্নিহিত হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা প্রাচীন বৈদিক ধর্ম হইতে পৃথক, ইহার অঙ্গ – প্রত্যঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম, বৌদ্ধধর্মের সুসদৃশ সন্তান।"[৩১]

প্রাচীন মগধ প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হলেও, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রভাব কাটিয়ে একদিন বঙ্গদেশকেও আলোড়িত করেছিল। ঠিক কবে বঙ্গদেশে এই ধর্মের প্রবেশ তা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে বুদ্ধদেব জীবিত থাকতেই এই কাজ সমাধা হয়েছিলো। পাল ও সেন যুগ খাস বাংলার সমৃদ্ধির যুগ। মৌর্য্য ও গুপ্তযুগের যা কিছু নিজস্ব ছিল শেষের এই দুই যুগে সেইগুলি বাঙ্গলার নিজস্ব হয়েছিল।

দীনেশচন্দ্র সেন গুপ্ত সাম্রাজ্য পরবর্তী বাংলায় হিন্দু বৌদ্ধ সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তখন হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যে সামগ্রিক অর্থেই একটা সম্প্রীতির ভাব ছিল যা সমকালীন সাহিত্য, শিল্পকলার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সেনরাজাদের রাজত্বকাল একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী এই সময়ে গুপ্তযুগের উদার হিন্দুধর্মের স্থলে জাত্যভিমানী

প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণব্যবস্থার ফলে সমাজের উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক দূরত্ব তৈরি হলে উচ্চবর্ণের দেবদেবী ও নিম্নবর্ণের দেবদেবী ভাগ হয়ে যায় -

সেনরাজাদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম এই দেশের সামাজিক জীবনের ওপর ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম তৎকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন আদর্শের দিক হইতে আবার নূতন সংস্কৃতি লাভ করিতে লাগিল। এই ভাবেই দেশে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মমতগুলির সৃষ্টি হয়। ক্রমে সমাজের ওপর মূল হিন্দুধর্মের প্রভাব যতই প্রবল হইতে আরম্ভ করিল ততই এই বিভিন্নমুখী লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি এক কেন্দ্রগত আদর্শের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহারই ফলে বর্তমান বাংলার হিন্দুসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।[৩২]

এই বিভাজন বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি, ফলে ভেতরে ভেতরে উভয় ধর্মের মধ্যে ঘটেছে সমন্বয়, পালদের রাজত্বকালে যা বেশি করে লক্ষ করা গেছে। পালরাজাদের সময় থেকে বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই গ্রহণ-বর্জন আরও পূর্ব থেকেই চলছিলো। তুর্কী আক্রমণ এখানে শুধুমাত্র অণুঘটকের কাজ করে। মিশ্র কতকগুলি লৌকিকধর্ম ও মিশ্রসত্ত্ব দেবতাদের উদ্ভব হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেরদেবতারা অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌকিক জনজীবনের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজার্চনার মধ্যে নিজেদের প্রতিস্থাপন করে। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম–বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে নবাগত আদর্শের উপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হয় সত্য, কিন্তু রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেনি; তাঁরা নূতনকে যেভাবে গ্রহণ করেছে সেগুলি পুরাতনেরই রূপান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নূতন পুরাতনের মিশ্রণের ভাবনায় উৎপন্ন দেবতারা নাম পেল মিশ্রসত্ত্ব দেবতা, যারা মঙ্গল কাব্যের দেবতা হিসেবে সুপরিচিত। এমনকি এই হিন্দু পৌরাণিক দেবতাদের গঠন বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিল রয়েছে –

সরস্বতী মূর্তিকল্পনা বহু প্রাচীন – অন্ততঃ পক্ষে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা ও দেবগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ অবশ্যই অনেক পরের ঘটনা। বৈদিক – যুগ থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে উপনীত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর প্রভাবে এবং শক্তিদেবতা দুর্গা - কালীর প্রভাবে বৌদ্ধতন্ত্রে দেবী ত্রয়ের রূপকল্পনা ইতিহাসসম্মত বলেই মনে করি।[৩৩]

হিন্দুদের সর্বমঙ্গলের দেবতা সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্তি বিশ্লেষণে একই কথা মনে হয়। বিঘ্নান্তক অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা প্রধানত দ্বারপাল রূপে পরিগণিত হয়েছেন। বিঘ্ন অর্থে বাধা, কিন্তু বজ্রযানে বিঘ্ন বলতে হিন্দু দেবতা গণেশকে বোঝায়। যেহেতু গণেশ সিদ্ধিদাতারূপে পূজিত হন, সেইজন্য বৌদ্ধরা তাকে বিঘ্নরূপী মনে করেন এবং বিঘ্নান্তকের কল্পনা করেছেন। শুধু গণেশ বা সরস্বতীর রূপের মধ্যেই নয় হিন্দুদের বেশিরভাগ দৈবী ভাবনার মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধদেবতার ধারণা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য–পরিষৎ-পত্রিকা-র অভিভাষণে বলছেন– ছোটবেলায় গল্প শুনেছি যদি একটি কাঁচপোকা ও একটি আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে আরশোলাটা কাঁচপোকা হয়ে গেছে, দুটোই কাঁচপোকা হয়ে গেছে। তাদের ইতর বিশেষ করা যায় না। মঙ্গলকাব্যে বৌদ্ধভাবনার প্রতিগ্রহণ প্রসঙ্গেও এই কথা প্রযোজ্য। তেমনি মুসলিম অধীনে পীড়িত হিন্দু বৌদ্ধ দুই জাতি হিন্দুতেই পরিণত হয়েছে, আর মঙ্গলকাব্য হয়ে গেছে এই সন্ধিক্ষণের কাব্য। যেখানে দুইয়ের লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছে নতুনের খোলসধারী পুরোনো। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম মূল নীতি থেকে সরে এসেছিল, টান পড়েছিল নৈতিক শিথিলতায় যার পরিণতি স্বরূপ সময়ের হাত ধরে নতুন রূপান্তরের সূচিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের এই বৌদ্ধ ভাবনার দিকটি নিয়ে উনিশ শতক থেকে যে গবেষণা সূচিত হয়েছিল, সেই গবেষণার ধারা আজও অব্যাহত।

উপসংহার :

এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের মধ্যে বৌদ্ধ উত্তরাধিকার কতোটা রক্ষিত হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ দুটি ধর্ম বহুকাল পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে উভয়ের মধ্যে মতবাদের আদান-প্রদান হয়েছিল। এই জন্য বৌদ্ধ পরবর্তী মধ্যযুগের হিন্দু সমাজের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই বৌদ্ধধর্মের ছাপ লক্ষ করা যায়। এমনকি উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের সাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে। যেমন- হিন্দুমতে যাকে কৈবল্য নাম দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, বৌদ্ধমতে সেটা নির্বাণ নাম পেয়েছে। ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে এসে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলো সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হয়েছিল ভারতবর্ষের মাটিতে। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমাকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সেদিন ভারতবর্ষ স্বীকার করে নিয়েছিল পৃথিবীর অন্য দেশ ও দেশের মানুষগুলিকে। সত্যের জোয়ারে ভেঙে গিয়েছিল বর্ণের বেড়াজাল; ভারতের আমন্ত্রণ গিয়ে পৌঁছেছিল বিদেশের মানুষের কাছে। তিনি কাউকে অবজ্ঞা করেননি বা ঘৃণা করে দূরে ফেলে রাখেননি। বৌদ্ধধর্মকে ঘিরে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনার কাজ ও চলেছে ধারাবাহিকভাবে। আবার শুধু লুপ্ত হয়ে যাওয়া সমাজের মধ্যেই এই ধর্মের গুরুত্ব থেমে থাকেনি, বরং আধুনিক কালেও বৌদ্ধধর্মকে নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজে উৎসাহ বাড়িয়ে চলেছে।

তথ্যসুত্র :

১. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ (২০০০), বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১

২. ষোড়শ মহাজনপদ : মহাজন শব্দের অর্থ হল বিশাল সাম্রাজ্য। বৌদ্ধ গ্রন্থে বেশ কয়েকবার এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থ অঙ্গুত্তরানিকয়া মহাবস্তুতে ১৬টি মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারের পূর্বে ভারতের উত্তর-উত্তর পশ্চিমাংশে উত্থিত এবং বিস্তৃত হয়। এই ১৬ টি দেশ হল- অবন্তী, অস্মক, অঙ্গ, কম্বোজ, কাশী, কুরু, কোশল, গান্ধার, চেদি, বজ্জি বা বৃজি, বৎস, পাঞ্চাল, মগধ, মৎস্য বা মচ্ছ, মল্ল, শূরসেন। যাদের নিয়েই তৈরি হয়েছিল ষোড়শ মহাজনপদ।

সূত্র : চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯), গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫০

৩. তেলপত্ত জাতক: তেলপত্ত জাতক হল জাতক সংখ্যা ৯৬। যেখানে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে একজন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর যৌবনাবস্থায় প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজভবনে ভোজনের জন্য এলে বোধিসত্ত্ব তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি একদিন তাঁদের প্রণাম জানিয়ে নিজের রাজা হওয়ার বাসনার কথা জানান। তখন তাঁরা তাকে উপদেশ দেন যে, উক্ত রাজ্যের দ্বিসহস্র যোজন দূরে অবস্থানকারী গান্ধার রাজ্যে সাত দিনের মধ্যে পৌঁছাতে পারলেই বোধিসত্ত্ব রাজা হতে পারবেন। তাঁর যাত্রাপথে ছিল ভয়ঙ্কর যক্ষিণীদের আনাগোনা ও প্রাণনাশের সম্ভাবনা। তাসত্ত্বেও বোধিসত্ত্ব প্রত্যেকবুদ্ধগণের আশীর্বাদ নিয়ে রওনা হন। বন পথে বিপদ এলেও ইন্দ্রিয়দমন করে যক্ষিণীদের হাত থেকে নিস্তার পান। তাঁর এই সংযম দেখে গান্ধারবাসীরা তাকে তক্ষশীলার রাজার পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।
সূত্র : মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪ – ২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত), বৌদ্ধকোষ, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৪৯

৪. অঙ্গুত্তরনিকা : পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত চতুর্থ নিকায় বা সূত্রসংগ্রহের নাম অঙ্গুরত্তরনিকায়। এই নিকায়ের মধ্যে আনুমানিক মোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটি এগারটি নিপাত বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং

প্রত্যেকটি নিপাত আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত। নিপাতগুলিকে ঊর্ধ্বক্রমসংখ্যায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই নিকায়গুলির মধ্যে সমাজের বিবিধ বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন –

ক) একনিপাত যেখানে রয়েছে তথাগতের কথা, স্বামী-স্ত্রীর কথা, নির্বাণলাভের কথা ইত্যাদি বিষয় গুলি।

খ) দুকনিপাত যেখানে রয়েছে দুরকম বুদ্ধ, দুই প্রকার বনবাসের ও দুই প্রকার দানের বর্ণনা এছারাও অন্যান্য বিষয়ের কথাও এখানে উল্লেখিত রয়েছে।

গ) তিকনিপাত এই তিন সংখ্যা যুক্ত নিপাতে রয়েছে তিন প্রকার পাপকর্ম, তিন প্রকার দেবতার দূতের বর্ণনা ইত্যাদি।

ঘ) চতুক্কনিপাত এখানে রয়েছে পাপসঞ্চয়ের চার কারণ, ধর্মবিনয় থেকে বিমুক্তির চার বর্ণনা ইত্যাদি।

ঙ) পঞ্চকনিপাত যেখানে রয়েছে শৈক্ষের নির্বাণলাভের পাঁচটি বল, পাঁচটি নীবরণ ও ইত্যাদি।

চ) ছক্কনিপাত এই ছয় সংখ্যায় থাকবে ভিক্ষুর ছয়টি পালনীয় ধর্মের কথা, ছয়টি উচ্চতম বিষয়ের কথা ইত্যাদি।

ছ) সত্তকনিপাত এই সাত সংখ্যার নিপাতে সাত প্রকার শ্রদ্ধা, শীল ও ধনের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু বিষয়ও এখানে স্থান পেয়েছে।

জ) অটঠকনিপাত এই আট সংখ্যার নিপাতে রয়েছে আট প্রকার বন্ধন, আট প্রকার দান ইত্যাদি।

ঝ) নবকনিপাত এখানে রয়েছে নয় প্রকার ব্যক্তি, নয় প্রকার সংজ্ঞা ও চিন্তার কথা ও ইত্যাদি বিষয়।

ঞ) দসকনিপাত এই দশ সংখ্যার বিষয়ে রয়েছে দশ প্রকার বুদ্ধি, ধর্মের দশ মুলতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি।

ট) একাদসকনিপাত এই সংখ্যায় রয়েছে নির্বাণে পৌঁছাবার এগারটি পথের বর্ণনা, আসব জ্ঞান লাভের জন্য এগারটি গুরুধর্ম বর্ণনা ও ইত্যাদি বিষয় গুলি।

সূত্র: ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত) চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র (১৯৮৫- ৮৬), বৌদ্ধকোষ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫-৭

৫. দাশ, আশা (১৯৬৯), বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৬

৬. দাশগুপ্ত, নলিনিনাথ (১৩৫৫), বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, কলকাতা : এ. মুখার্জী, পৃ. ৪০

৭. পুণ্ড্রবর্ধন: ঋগবেদে পুণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন তাম্রশাসনেও পুণ্ড্রদেশের রাজধানী এই পুণ্ড্রবর্ধন নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা পর্যটক গঙ্গা থেকে পুণ্ড্রবর্ধন নগরের দূরত্ব দেখান ১০০ মাইল। তার বর্ণনায় উক্ত অঞ্চলের নাম ছিল–পু-ন্ন–ফ-ত-ন্ন। এই রাজ্যের কোন রাজার নাম জানা যায়নি। তাই অনুমান করা যায় এই রাজ্যটিও হর্ষবর্ধনের রাজত্বের অধীনেই ছিল।

সূত্র: চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯), গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪৫

৮. সমতট: বঙ্গদেশের আরেক নাম হল সমতট। হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকে এই রাজ্যের আয়তন সম্পর্কে জানা যায়। এখানে জলবায়ু ছিল প্রীতিকর, শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমি ছিল উর্বর। এখানে মোট ত্রিশটি সঙ্ঘারাম ছিল যেখানে ২ হাজার ব্রাহ্মণ বাস করতেন। রাজ্যে ১০০ টির মতো দেবমন্দির ছিল। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সূত্র: চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯), গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৫

৯. মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র: কিছু মহাযান সূত্র রয়েছে যেগুলিতে মহাযান দৃষ্টিভঙ্গীর বৌদ্ধধর্মতত্ত্বের দার্শনিক পর্যালোচনা। এই গ্রন্থের মধ্যে– দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। তবে এখানে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের পরিপূর্ণতার আলোচনা এখানে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রজ্ঞা হল শূন্যতা জ্ঞান অর্থাৎ সমগ্র জাগতিক বস্তু এবং ধর্মের আপেক্ষিক অস্তিত্ব ও নৈরাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞান। এই গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ

তাঁর শিষয়দের সঙ্গে কথা বলেছেন। মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র ছিল প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থাবলির একটি বিশ্বকোষতুল্য সংকলন। এই গ্রন্থটি নাগার্জুনের রচনা বলে কথিত। হিউয়েন সাং ও তাঁর সহকারীরা এই গ্রন্থকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বইটি পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র নামেও পরিচিত।

সূত্র : চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র নাথ (২০১৪) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত), বৌদ্ধ সাহিত্য, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ–গ্রন্থমালা ৩, কলকাতা : মহাবোধি, পৃ. ২২৬-২২৯

১০. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯), গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, কলকাতা : দ্বেজ, পৃ. ৬৮

১১. ক্ষান্তি বা খন্তি : এই খান্তিবাদি জাতকের সংখ্যা ৩১৩। এখানে শাস্তা জেতবনে অবস্থান করেছিলেন। লোকে গাল দিলে বা প্রহার করলে যে কোন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করলেও মানুষের মনের যে অক্রুদ্ধভাব, তার নাম খান্তি। বোধিসত্ত্ব রাজাকে এই সংজ্ঞা দিয়েছেন খান্তির। অর্থাৎ অপরের দ্বারা পীড়নেও যখন মানুষের বিকার হয়না তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় খান্তি।

সূত্র : বড়ুয়া, শুভ্রা (২০০০- ২০০১) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত), বৌদ্ধকোষ, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতাঃ পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪২৩

১২. চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (সম্পাদিত) (১৩৬৬)। জয়দেবের গীত গোবিন্দম্। কলকাতা: দেব প্রেস। পৃ. ৩৫।

১৩. **দশমহাবিদ্যা**: শক্তিদেবতার বহুদিন মূর্তির মধ্যে দশ মহাবিদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে ও তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার রূপ বর্ণিত হয়েছে। দশমহাবিদ্যার উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। যথা – দক্ষযজ্ঞে শিব – সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হলে শিবের অনুমিত আদায়ের উদ্দেশ্য সতী শিবকে দশটি ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। দেবীর এই দশটি রূপ দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত। এই রূপগুলি হল – কালী, তারা, ত্রিপুরসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, কমলাকামিনী।

সূত্র: ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭), হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা : ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড, পৃ. ২৬৫

১৪. বোধিসত্ত্ব : 'বোধি' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, আবার সত্ত্ব শব্দের অর্থ হল প্রাণী। বোধিসত্ত্ব শব্দের একত্রে অর্থ হল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। এই ব্যক্তি পৃথিবীর শুধু নিজের দুঃখ নিবারণ করে সন্তুষ্টি পায়না, তিনি সমগ্র দেব-মানবসমাজকে ভব দুঃখ থেকে উদ্ধার করতে নিজের কাছেই সংকল্পবদ্ধ থাকেন। বুদ্ধতলাভের জন্য কোন সম্যক-সম্বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, এই প্রার্থনাকারী ব্যক্তি আটটি গুণের অধিকারী হতে হয়। যেমন –

ক) মানবজন্ম লাভ করতে হবে, অন্য কোন প্রানী রূপে প্রার্থনা করলে তা পূর্ণ হয় না।

খ) পুরুষ হয়ে জন্মাতে হবে। স্ত্রী নপুংসক হলে হবে না।

গ) অর্হত্ব লাভের জন্য উপযুক্ত পুণ্যরূপ হেতু থাকতে হবে।

ঘ) বুদ্ধের দর্শন পেতে হবে। তাঁর সামনে প্রার্থনা করতে হবে।

ঙ) প্রার্থনাকারীকে সংসারত্যাগী প্রব্রজিত হতে হবে।

চ) তাঁকে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি হতে হবে।

ছ) বুদ্ধত্বলাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ - এই ত্যাগের শক্তিতেই তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

জ) তাঁকে বুদ্ধকারক ধর্ম দশপারমী পূরণের মহান প্রচেষ্টা রাখতে হবে।

উক্ত অষ্টগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি সম্যক সম্বুদ্ধের থেকে বুদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী শুনলেই ব্যক্তির কার্যসিদ্ধি হবে, তিনি বোধিসত্ত্ব নাম পাবেন। ত্রিপিটক গ্রন্থে বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতমকে, তাঁর পূর্বজন্মের বিশ্লেষণ করে তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সূত্র : বড়ুয়া, শুভ্রা (২০০০- ২০০১) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত), বৌদ্ধকোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৪৫-৮৪৭

১৫. ত্রিপিটক : বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অনেক বিভাগ রয়েছে, কিন্তু সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যের নাম ত্রিপিটক, বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধের বচনগুলি এই গ্রন্থে গ্রথিত রয়েছে। এই গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা– ক) বিনয় পিটক, খ) সুত্ত পিটক ও গ) অভিধর্ম পিটক। এদের মধ্যে বিনয় পিটকই শ্রেষ্ঠ। পিটক শব্দের অর্থ পেটিকা বা ঝুড়ি। কথিত আছে বুদ্ধের মৃত্যুর পরে প্রথম মহাসংগীতির সময়ে (৪০০ খ্রিস্ট.পূর্ব.) রাজগৃহে আগত শিষ্যরা, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ ও সংস্থাপন করেন। তখনও পর্যন্ত দ্বিপিটক ছিল। তৃতীয় মহাসংগীতির (২৫০ খ্রিস্ট.পূর্ব.) সময়ে এই ত্রিপিটকের প্রথম সংকলন হয়। ত্রিপিটকের লক্ষ হল ত্রিবিধ।

সূত্র: মুখার্জী, বন্দনা (২০০৪- ২০০৫) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত), বৌদ্ধকোষ, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা : পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯

১৬. দশপারমিতা : দুঃখমুক্তির পারে উত্তীর্ণ হওয়ার যে চর্যা, যে সাধনা, যে সৎকর্মাদির অনুষ্ঠান তাকেই বলে পারমিতা বা পারমী (পালি শব্দ পারমী)। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে সমস্ত সৎকর্ম করেছেন তাদেরকে একসঙ্গে পারমিতা বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় ১০ প্রকার পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা –

ক) দান, খ) শীল, গ) নৈষ্কাম্য, ঘ) সত্য, ঙ) ক্ষান্তি, চ) বীর্য, ছ) অধিষ্ঠান, জ) মৈত্রী, ঝ) উপেক্ষা, ঞ) প্রজ্ঞা উক্ত দশটি কর্মকেই পরবর্তীতে মহাযানে ৬ টি পারমিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূত্র : চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪), গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ৩৯২-৩৯৫

১৭. মৈত্রেয় বুদ্ধ : মেত্তেয্য বুদ্ধ বা মৈত্রেয় বুদ্ধ হলেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধ। 'চক্কবত্তিসীহনাদ সুত্ত' মতে যখন মানব সভ্যতার আশি বছর পার হয়ে যাবে, তখন তাঁর জন্ম হবে কেতুমতী নগরে বা বারাণসীতে। সেখানকার রাজা প্রাসাদ ত্যাগ করে, মৈত্রেয় বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এই মেত্তেয্য বুদ্ধ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মেত্তেয্য হল তাঁর গোত্রের নাম।

সূত্র : চ্যাটার্জী, জয়ন্তী (২০০৭) ভট্টাচার্য, বেলা (সম্পাদিত), বৌদ্ধকোষ, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা : পালি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯০৯

১৮. দাশ, আশা (১৯৬৯), বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৩

১৯. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৪৮৯

২০. হীনযান: বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের সময়ে মূলত বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই চারটি দল একত্রিত হয়ে প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে, নাম পায় মহাযান ও হীনযান। হীনযান এই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উক্ত দুই দলের মিশ্রণ ঘটে। এই থেরবাদীরা নিজেদের প্রাচীন সম্প্রদায় বলে মনে করেন। এই থেরবাদীদের সাহিত্যে দশপারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের প্রধান আদর্শ অর্হত্ত্বলাভ করা।

সূত্র : চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ২০৯-২১৫

২১. মহাযান : মূল বৌদ্ধ সম্প্রদায় হীনযান থেকেই মহাযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাসংগীতির (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৪) সময় কিছু ভিক্ষু নিজস্ব উদারপন্থী ভাবনাকে সামনে টানতে গিয়ে দল থেকে বিতারিত হয়ে, যে নতুন দল তৈরি করে যার নাম হল মহাযান। এদের মূল আদর্শ হল বুদ্ধত্বলাভ করা। এই মতাবলম্বীরা

চান জগতের প্রতিটি মানুষের হিতের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে। বোধিসত্ত্বলাভ করতেও এই মতাবলম্বীরা আগ্রহী হন। হীনযানদের এই মতবাদীদের মত কিছুটা ভিন্ন হয়ে ধরা পড়েছিল।

সূত্র : হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ২০৯-২১৫

২২. মাধ্যমিক: মহাযান সম্প্রদায় প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা মাধ্যমিক ও যোগাচার। এই মাধ্যমিক সম্প্রদায় নাগার্জুনের মধ্যমকশাস্ত্র কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। এদের কাছে 'শূন্যতা' মুখ্যরূপ ভূমিকা পালন করেছিল। নাগার্জুন তাঁর গ্রন্থে কারিকার সাহায্যে শূন্যের উপস্থাপন করেন। বুদ্ধের মধ্যমপন্থা কে সামনে রেখে শূন্যের দর্শনকে জনসমক্ষে আনা হয়েছিল। তাঁদের মতে সংসার, নির্বাণ ও শূন্যতা এই তিন একই সূত্রে বাঁধা। তাঁরা আরও বলেন- অস্তি-নাস্তি, আত্মা-অনাত্মা, নিত্য-অনিত্য এগুলিকে দিয়ে মধ্যমপন্থাকে বিচার করা সম্ভব নয়। তাঁদের কাছে পরমার্থ শব্দটিই শূন্যতার সমতুল্য।

সূত্র : হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ২০৫-২০৭

২৩. যোগাচার: নালন্দা বিহারে নাগার্জুন যখন অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁর একদল অনুগামীদের মনে প্রশ্নের উদয় হয়, যা ঘিরে পরবর্তীতে বিবাদ হয় ও নতুন দলের উদ্ভব হয়। এই নতুন দলটি যোগাচার সম্প্রদায় বা বিজ্ঞানবাদ নামে পরিচিত। কথিত আছে এই দলের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথ, যার শিষ্য ছিলেন অসংগ। এই মতাবলম্বীরা বোধিলাভের জন্য যোগমার্গকে বেছে নিয়েছিলেন। অসংগের লিখিত দুটি গ্রন্থ হল – সূত্রালংকার ও বোধিসত্ত্বভূমি। উক্ত গ্রন্থ দুটিতে বোধিজ্ঞান লাভের স্তরগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। এই সম্প্রদায়ীরা মনে করেন তাঁদের কথিত ১০টি সাধনমার্গের স্তর অতিক্রম করলেই বোধিসত্ত্ব লাভ করা যাবে।

সূত্র : হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ২০৭-২০৯

২৪. মন্ত্রযান: মন্ত্রকে আশ্রয় করে সাধনার যে পথ গড়ে উঠেছিল তা মন্ত্রযান নামে পরিচিত। বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য শাখার মতো এই শাখাটিও মনুষ্যত্বের বিকাশ, উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিকতার সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছিল। মন্ত্রতন্ত্রযুক্ত তান্ত্রিকতা প্রাচীনযুগ থেকেই ভারতবর্ষে অস্তিত্ববজায় রেখেছিল, এই শাখাটি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি গূঢ় রহস্যময় বৌদ্ধধর্মের জন্ম দিয়েছিল। মন্ত্রের সঙ্গে মুদ্রার গভীর মিল রয়েছে, হাতের আঙ্গুল ও চিহ্নের সাহায্যে মুদ্রাগুলি দেখানো হত। মন্ত্রতন্ত্রগুলির শব্দের গোপনীয়তার সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শের ব্যাপারটিও এখানে এসে যেত।

সূত্র : হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ২২১-২২৫

২৫. সহজযান: তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে 'সহজ' শব্দের অর্থ হল মহাসুখ। বজ্রযানের একটি শাখা হল সহজযান। পালরাজাদের সময়ে এই ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এখানে করুণা হল পুরুষ, শূন্যতা হল প্রকৃতি। শূন্যতা ও করুণার মিলনে উৎপাদন হয় বোধিচিত্ত যা নারী ও পুরুষের মিলিত যোগমার্গের এক অনির্বচনীয় অবস্থা, যা নাম দেওয়া হয়েছিল 'মহাসুখ'। এই সম্প্রদায়ের তত্ত্বের দিকগুলি জনসাধারণের কাছে জটিল বলে মনে হয়েছিল, তাই সমকালীন মানুষেরা এই শাখার ধ্যানধারণা, মন্ত্রতন্ত্র ও মুদ্রাধারণের রীতিগুলিতে বেশি করে আকৃষ্ট হয়ে, এগুলিকেই বুদ্ধত্বলাভের প্রকৃষ্টউপায় বলে মনে করেন। বৌদ্ধসহজিয়ারা প্রচার করেন যে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং স্ত্রী গোপার সঙ্গে সহজ সাধনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। চর্যাপদে (১৯০৭) উত্থিত যে – লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ ব্যক্তিরা এই সহজযান সাধনার সাধক ছিলেন।

সূত্র : হালদার (দে), মণিকুন্তলা (২০১০) চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ২২৮-২৩৪

২৬. প্রজ্ঞাপারমিতা: মহাযান সম্প্রদায়ের বর্ণিত পারমিতার ষষ্ঠ স্থান অধিকারী পারমিতা হল এই প্রজ্ঞা পারমিতা। আবার প্রাথমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারমিতার দশম স্থান অধিকার করে আছে এই প্রজ্ঞা পারমিতা। তবে প্রথমের ভাবনা থেকে পরবর্তীতে এই পারমিতার কিছুটা ভাবগত পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে প্রজ্ঞা বলতে বোঝাতো বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞা পারমিতা – র অভ্যাস করেছিলেন। এই পারমিতার দ্বারা বিপশ্যনা প্রাপ্তি হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে সংসার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মতায় পরিপূর্ণ। জাতক সংখ্যা ৪০২ এ প্রজ্ঞা পারমিতা সম্পর্কিত গল্পটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সূত্র : চৌধুরী, সুকোমল (সম্পাদিত) (২০১৪), গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ৩৯২-৪০৩

২৭. দাশ, আশা (১৯৬৯), বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ১৩

২৮. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০০১), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৫৮৩

২৯. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (১৩৫৮), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, পৃ. ১০৩

৩০. সেন, সুকুমার (১৯৭০), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, কলকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, পৃ. ৬৪

৩১. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত (২০০৯), গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, কলকাতা : দেজ, পৃ. ২৭

৩২. সেন, শ্রীদীনেশ চন্দ্র (১৩৪১), বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, কলকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৪৮

৩৩. ভট্টাচার্য্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৭), হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব, কলকাতা : ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড, পৃ. ৩২